যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ২১/০৩/২০২১ (পৃঃ ০৪)

ড. প্রণব কুমার সাহা রায়

পঞ্চাশ বছরে খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রির অবদান

এ মাসেই পূর্ণ হচ্ছে স্বাধীনতার ৫০ বছর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ বছরটি মুজিববর্ষ হিসাবেও পালিত হচ্ছে। সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক যাত্রা অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। বিশেষত খাদ্য নিরাপত্তার অভাব তখন বড় সংকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্বাধীনতার সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। তখন আউশ মৌসুমে বোনা আউশ, আমন মৌসুমে রোপা আমন এবং বোরো মৌসুমে হাওড়-বিল এলাকার নিচু জমিতে দেশি জাতের ধানের চাষ হতো। এসব ধানের উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম। তখন খাদ্যাভাব ছিল মানুষের নিত্যসঙ্গী। বাংলার মানুষের এ অভাবের জ্বালা বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দেশের কৃষি, কৃষক ও কৃষিবিদের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। স্বাধীনতার পর শস্য উৎপাদনে সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তিনি শুরুতেই কৃষি খাতে ধানের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। এ তাড়না থেকেই তিনি ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেন এবং কৃষিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই রাগ করবেন না, দুনিয়া ভরে চেষ্টা করেও আমি চাল কিনতে পারছি না। চাল পাওয়া যায় না। যদি চাল খেতে হয় আপনাদের চাল পয়দা করে খেতে হবে। তার এ ঘোষণার ফলেই দেশে ধান গবেষণা কার্যক্রম নতুন মোড় নেয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৭৩ সালেই অনুমোদন পায় বিআর-৩, যা ধান উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। ফলন ছিল হেক্টর প্রতি ৪ টনের মতো। বিপ্লব নামে পরিচিত জাতটি খাটো বলে বাজারে খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও গবেষণা কার্যক্রম তার নির্দেশিত পথেই চলতে থাকে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বেশকিছু ভালো জাত উদ্ভাবিত হলেও বাজারে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি বলে দীর্ঘদিন জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেনি। তবে এসব জাত উদ্ভাবিত হওয়ায় রোপা আমন কর্তনের পর যেসব জমি পতিত পড়ে থাকত, সেখানে বোরো মৌসুমে সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে দেশের খাদ্যাভাব দূর হতে থাকে।

মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার প্রথমটি খাদ্য, আর বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষের প্রধান খাবার ভাত। তাই স্বাধীনতার পর উচ্চফলনশীল ধান উদ্ভাবন ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আজ ২০২১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৭ কোটি হয়েছে। একইসঙ্গে আবাদি জমির পরিমাণ অনেক কমে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ স্বয়ংসম্পূর্ণতার মূলে রয়েছে ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী ব্রিধান ২৮ এবং ব্রিধান ২৯— এ দুটি ধানের জাত। উদ্ভাবনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় সফলতা আসে ১৯৯৪ সালে এ দুটি জাত অবমুক্ত হওয়ার পর। বোরো মৌসুমে যেসব এলাকায় আগাম জাতের চাহিদা আছে অথবা বোরো ফসলের পর রোপা আউশ বা পাটচাষ করা হয়, সেসব এলাকার জন্য ব্রিধান ২৮ জাতটি বিশেষ উপযোগী। যেসব এলাকায় বোরো ফসলের পর রোপা আমন চাষ করা হয় বা একফসলি হিসাবে শুধু বোরো চাষ হয়, সেসব এলাকার জন্য ব্রিধান ২৯ জাতটি বিশেষ উপযোগী। ব্রিধান ২৮-এর চাল মাঝারি চিকন সাদা। ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু। ব্রিধান ২৯-এর চাল ব্রিধান ২৮-এরই মতো, তবে কিছুটা ছোট ও চিকন। ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু।

স্বাধীনতার পর প্রথম অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদন হয়েছিল ৯৮ লাখ টন। দেশে এখন দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে প্রায় সোয়া ৪ কোটি টন। এর মধ্যে শুধু চালই উৎপাদন হচ্ছে ৩ কোটি ৬০ লাখ টন। শস্য উৎপাদন খাতে এ প্রাচুর্যের পথপ্রদর্শক ব্রিধান ২৮ ও ২৯। দেশে চাল উৎপাদনে রীতিমতো বিপ্লব এনে দিয়েছে এ জাত দুটি। এখনো দেশে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে এ দুই জাতের ধানই নেতৃস্থানীয় অবদান রেখে চলেছে। দেশে প্রধান খাদ্যশস্য চালের মোট উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশই পূরণ করছে ব্রিধান ২৮ ও ২৯। ১৯৯৯ সালে দেশে খাদ্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে, তার পেছনে ব্রিধান ২৮ ও ব্রিধান ২৯ বড় ভূমিকা রেখেছে। এখন দেশের মোট ধানের অর্ধেকই জোগান দিচ্ছে বোরো মৌসুম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে চালের উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৬৪ লাখ টন। সেখানে বোরো ধানের অবদান ছিল প্রায় ৫৪ শতাংশ। বর্তমানে বোরো মৌসুমে যে পরিমাণ ধান চাষ হয়, তার প্রায় ৬০ শতাংশই ব্রিধান ২৮ বা ২৯ জাতের। এর আগ পর্যন্ত দেশের মোট ধান উৎপাদনে প্রাধান্য ছিল বৃষ্টিনির্ভর আমন ধানের। কিন্তু এ জাত দুটি উদ্ভাবনের পর সেচ সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোরো চাষের আবাদে বড় পরিবর্তন আসে। ধান উৎপাদনের জন্য এখন বোরো মৌসুমের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। জাত উদ্ভাবনের জন্য ব্রিতে তখন মৌসুমের ওপর ভিত্তি করে প্রজেক্ট নেওয়া হতো। বোরো মৌসুমে উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য ব্রির ব্রিডিং ডিভিশনের ইরিগেটেড রাইস প্রজেক্ট থেকে এ দুটি জাত উদ্ভাবিত হয়। এ প্রজেক্টের প্রজেক্ট লিডার ছিলাম আমি এবং আমার সঙ্গে ছিলেন ড. তানভীর আহমেদ, ড. খাজা গুলজার হোসেন এবং ড. কামরুন নাহার।

জাত দুটির উদ্ভাবন এবং কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করার পেছনে তৎকালীন ব্রিডিং ডিভিশনের বিভাগীয় প্রধান ড. নূর মোহাম্মদ মিঞার উপদেশ ও নির্দেশ অনস্বীকার্য।

১৯৯৪ সালে অবমুক্ত হওয়ার পর থেকেই জাত দুটি দেশের কৃষিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে আসছে। জাত দুটি উচ্চফলনশীল, ভাত সুস্বাদু, গাছ মাঝারি উঁচু হওয়ায় এবং কৃষকের খড়ের চাহিদা পূরণ করায়, সর্বোপরি মোটামুটি রোগ-বালাই প্রতিরোধী হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে সহজেই জনপ্রিয়তা পায়। ব্রিধান ২৯-এর উচ্চফলনের জন্য হাইব্রিড ধানের জাতও কৃষকের কাছে খুব একটা জনপ্রিয়তা পাচ্ছে না। হাইব্রিড ধানের সঙ্গে একই ব্যবস্থাপনায় চাষ করে ব্রিধান ২৯-এর ফলন ১০ টন পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

গত কয়েক দশকে চালের উৎপাদনে ধারাবাহিকতা থাকায় দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় স্বস্তি এসেছে, যার পেছনে বড় অবদান রয়েছে জাত দুটির। তবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই রাখতে ব্রি শুধু এ দুটি জাতের ওপর নির্ভর না করে বেশকিছু বিকল্প জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করেছে এবং করে যাচ্ছে। সেচ ও চাষাবাদ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে এ দুটি জাত দেশে ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। একইসঙ্গে ব্রিধান ২৮ ও ব্রিধান ২৯ মানুষের ক্ষুধামুক্তি ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারায় মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একজন সফল ব্রিডার হিসাবে গৌরববোধ করছি।

ড. প্রণব কুমার সাহা রায় : *অবসরপ্রাপ্ত চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার; বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)*